Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue 53
January–March, 2018

নীতিবিজ্ঞান ও আইনের সম্পর্ক: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা

Relation between Ethics and Law: A Review in the Light of Islam

Md. Mohsin Uddin*

ABSTRACT

The function of ethics, as a subject, is to assess the positive and negative behavior of an individual and judge the 'dos' and 'don'ts' based on morality. From the conventional viewpoint, only the voluntary actions of an individual are subjected to ethics. No forced action shall fall under it. It is verily conceivable that an individual shall be responsible for the action s/he has done at his own volition and he shall never be liable for the action he has been forced to do. Eventually there exists a clear distinction between ethics and law. In contrast, Islam teaches the morality which is integrated. In fact, the purport of Islam has been deeply rooted into the premise of moral teachings. The three apparatuses-adab (the principles of thought and behaviour), iĺsān (spiritual development) and akhlÉq (moral purification), play crucial role to determine the scope of ethics in Islam. Here law and ethics have been scientifically diluted. This article in adopting analytical and descriptive method provides the definition of ethics as found both in conventional and Islamic understandings and offers the mechanism of how this science has shaped the socio legal framework of Islamic legislation.

Keywords: ethics, law, morality, justice.

* Dr. Md. Mohsin Uddin is Dean of the School of Arts and Head of the Department of Islamic Studies, Asian University of Bangladesh, email: drmohsin.uddin@gmail.com

সারসংক্ষেপ

শাস্ত্র হিসেবে নীতিবিজ্ঞানের কাজ হলো, একটি নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ডের আলোকে মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের বিচার করা। প্রচলিত ধারণায় মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র নৈতিকতা বিচার্য, কোন বাধ্যতামূলক আচরণের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, যে কাজ মানুষ তার নিজ ইচ্ছা বা মর্জিতে করে তার জন্য সে অবশ্যই দায়ী থাকে। কিন্তু যে কাজ তার নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে করে বা করতে বাধ্য হয়, তার জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। এ কারণে নৈতিকতা ও আইনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য তৈরি হয়। ইসলাম যে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়, তা সমন্বিত। মূলত নৈতিক প্রস্তাবনার মধ্যেই ইসলামের মর্মবাণী নিহিত। ইসলামের আদব (চিন্তা ও আচরণের নীতিমালা), ইহসান (আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ) এবং আখলাক (নৈতিক শুদ্ধতা) এ তিনটা গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা ইসলামী নীতিবিজ্ঞানের পরিধি নির্ধারণ করে। এ ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও আইনের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পন্থায়। অত্র প্রবন্ধে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা শৈলিতে প্রচলিত ও ইসলামী নীতিবিজ্ঞানের পরিচিতি, এ বিজ্ঞানে মুসলিম অন্বেষা এবং আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ: নীতিবিজ্ঞান, আইন, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার।

ভূমিকা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে নীতিবিজ্ঞানের জন্ম খুব পুরনো নয়। নীতিবিজ্ঞান কী, এর বিষয়বস্তু ও পরিধি কী- এসব নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে নীতিবিজ্ঞানের বিকাশ অবশ্য রাতারাতি ঘটেনি। জ্ঞানকাণ্ডের বহু শাখার অসংখ্য লেখক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, আইনবেত্তা, সুফিসাধক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ তাদের লেখা ও চিন্তা দিয়ে নীতিবিজ্ঞানকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। আবু নাসর আল-ফারাবী [২৬০-৩৩৯ হি.] ও আবু আলী মিসকাওয়াইহ [মৃ. ৪২১ হি.]-এর মতো প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিকগণও অনেক দর্শন শাস্ত্রীয় জটিল তত্ত্ব ও ধারণা নৈতিকতা তথা নীতিবিজ্ঞানের আলোকে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করেছেন।

দার্শনিকদের পাশাপাশি মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকগণও নৈতিকতা বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। তাদের চিন্তা ও আলোচনা নীতিবিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রভূত গুরুত্ব বহন করে; কিন্তু তাদের এ অবদান নীতিবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ছাঁচে বিবৃত না হওয়ায় তা ধর্মতত্ত্বের বৃহৎ বিষয়বস্তুর একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবেই বিদিত হয়েছে।

এছাড়াও সুফিতাত্ত্বিক রচনা, আইনবিষয়ক নীতিমালা (أصول الفقه), সরকার ও প্রশাসনিক নীতিমালা (الأحكام السلطانية), সরকারি রাজস্ব ও ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন

গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নীতিবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র অধ্যয়নশাস্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করেছে।

মানবেতিহাসের শুরু থেকেই সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ জীবনে ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলে আসছে। যদিও সূচনালগ্নে আজকের মতো কোনো আইনী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, যা আইন প্রণয়ন, তার সংস্কার ও আধুনিকায়ন নিয়ে কাজ করতো। তখনকার দিনে কোন বিষয়ের আইন প্রয়োজন হলে রাজা-বাদশাহগণ নিজেদের মর্জিমতো নির্দেশ জারীর মাধ্যমে আইন রচনা করতেন। এ সময়কালে নৈতিকতাকে আইনের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এভাবেই আইনের ইতিহাসে নৈতিকতার অবস্থান তৈরি হয়। যুগের পরিবর্তন, সময়ের বিবর্তন, মানব সমাজে নতুন নতুন ধারণার উন্মেষের মধ্য দিয়ে বর্তমানে আইন প্রণয়নে বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠান জড়িত হলেও আইনের মৌলিক উপাদান হিসেবে নৈতিকতা স্বীয় অবস্থানে স্বকীয়। আইন ও নীতিবিজ্ঞানের এ গভীর সম্পর্ক অস্বীকার করার সুযোগ নেই। অত্র প্রবন্ধে নীতিবিজ্ঞানের পরিচিতি আলোচনাপূর্বক আইনের সাথে এর সম্পর্কের আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

নীতিবিজ্ঞান

নীতিবিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্রকে ইংরেজীতে বলা হয় Ethics, যা গ্রিক শব্দ Ethos থেকে এসেছে। এর অর্থ অভ্যাস বা প্রথা। Ethics-এর প্রায় সমার্থক ইংরেজী শব্দ Morals যা ব্যুৎপত্তিগতভাবে ল্যাটিন শব্দ Moralis থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায় সামাজিক আচার-আচরণ বা প্রথা (Mautner 1996, 137)।

পবিত্র কুরআনে Ethics এর ধারণাটি 'খুলুক' শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। দু'টি আয়াতে শব্দটি উল্লেখ হয়েছে:

১. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন" (Al-Qurān, 68:4)।

২. إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ "এটা তো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব" (Al-Qurān, 26:137)।

বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ 'আবদিল্লাহ আল-কুরতুবী [৬০০-৬৭১হি.] 'খুলুক আল আওয়ালিয়্যিন' পরিভাষাটি প্রাচীন রেওয়াজ অর্থে ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও তার মতে, এ প্রত্যয়টি ধর্ম, চরিত্র, আদর্শ বা মাযহাব অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে (Al-Qurtubī 2003, 13/85)।

নীতিবিজ্ঞান কী? এ প্রশ্নের উত্তরে একক কোন মত খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। নৈতিকতাকে (Morality) যদি ধর্মের সাথে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে আল-কুরতুবীর

ভাষ্য অনুযায়ী, নৈতিকতা বলতে বুঝায় সামাজিক প্রথা। কোনো সম্প্রদায়ের প্রথাগত নৈতিকতা এবং আচরণগত নৈতিকতা এক্ষেত্রে ভিন্ন রকম। যেমন, হাত দিয়ে খাবার খাওয়া অথবা খাবার খেতে ছুরি বা কাটাচামচ ব্যবহার করা একটি প্রথাগত নৈতিকতা। অন্যদিকে, অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যাওয়া একটি আচরণগত নৈতিকতা। বলা বাহুল্য, প্রথাগত নৈতিকতার চেয়ে আচরণগত নৈতিকতাই শাস্ত্রীয় পরিমণ্ডলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

Loudon নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন:

> "Ethics are moral standard that help guide behaviour, actions and choices. Ethics are grounded in the notion of responsibility (as free moral agents, individuals, organizations and societies are responsible for the actions that they take) and accountability (individuals, organizations, and society should be held accountable to others for the consequences of their actions). In most societies, a system of laws codifies the most holding people, organizations, and even governments accountable" (Laudon 1996, 513)

নীতিবিজ্ঞানে আলোচিত মানুষের আচরণ, কার্য ও চাহিদা বিষয়ক নির্দেশনা নানা সূত্র থেকে উৎসারিত। তবে, আবূ হামিদ আল-গাজালী [৪৫০-৫০৫হি.] এ ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, দর্শন শাস্ত্রের অন্যান্য শাখার মতো নৈতিকতা বিষয়ক জ্ঞান গ্রিক দার্শনিকদের সৃষ্ট জ্ঞানভান্ডার থেকে ধার করা কোনো জ্ঞান নয়, বরং নৈতিকতা বিষয়ক সমস্ত জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকেই প্রাপ্ত (Al-Gazālī 1981, 110)।

এক কথায়, নীতিবিজ্ঞান মানুষের আচরণ, কার্য ও চাহিদা বিষয়ক একটি প্রমিত নীতিনির্দেশিকা- যা তাকে জীবন চলার পথে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

নীতিবিজ্ঞানের পরিধি ও শাখা

নীতিবিজ্ঞান একটি বৃহৎ পরিসরের বিজ্ঞান। নীতিবিজ্ঞান নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনাকে তিনটি শাখায় ভাগ করা যেতে পারে, ১. বর্ণনামূলক (Descriptive)[১] ২. নিয়মাচারমূলক (Normative)[২] এবং ৩. অধি-নৈতিকতামূলক (Metaethics)[৩]।

---

[১] Descriptive Ethics সম্পর্কে Wikipedia তে লেখা হয়েছে: "Descriptive ethics is a value-free approach to ethics which examines ethics not form a top down a priori perspective but rather observations of actual choices made by moral agents in practice".

[২] Wikipedia তে Normative ethics সম্পর্কে লেখা হয়েছে: Normative ethics is the branch of philosophical ethics concerned with what people should believe

বর্ণনামূলক এবং নিয়মাচারমূলক নৈতিকতাকে আরো বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, আলোচনামূলক, ব্যাখ্যামূলক (Explanatory) এবং ভবিষ্যৎবাচনিক (Predictive) নৈতিকতা। অন্যদিকে, অধি-নৈতিকতাকে (Meta-ethics) আবার ব্যবস্থানির্দেশক নৈতিকতা (Prescriptive Ethics) বা যুক্তিসিদ্ধ নৈতিকতাও (Ethics of Justification) বলা যেতে পারে। নীতিবিজ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণমূলক (Control) নৈতিকতা।

বর্ণনামূলক নৈতিকতা (Descriptive Ethics) একটি সমাজে ব্যক্তি-আচরণ যেসব নীতিমালা দ্বারা শাসিত, সেসব নৈতিকতাকে বলে। যেমন, সমাজের চোখে কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, বা কোনটি করণীয় আর কোনটি বর্জনীয় তা স্বাভাবিকভাবে অনুসরণ করা। এক্ষেত্রে অনুসরণীয় কাজটি সঠিক না ভুল তা বিবেচ্য নয়; বরং তা নৃতাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও মনোবিদদের কাজ।

ব্যাখ্যামূলক নৈতিকতা (Explanatory Ethics) মানব আচরণকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে এবং কোনো কাজের নেপথ্য উদ্দেশ্য কি তা বের করার চেষ্টা করে। এরূপ নেপথ্য উদ্দেশ্য নৈতিকতাপূর্ণ হতে পারে, আবার অনৈতিকতাপূর্ণ বা নৈতিকতার বিষয়বহির্ভূতও হতে পারে। নৈতিকতার বিষয় বহির্ভূত উদ্দেশ্যের উদাহরণ এরকম: 'সে কাজটি করেছিল কারণ তখন সে ছিল অচেতন অবস্থায় বা সে বাধ্য হয়ে কাজটি করেছিল'। অনৈতিকতাপূর্ণ উদ্দেশ্যের উদাহরণ নিম্নরূপ: 'সে তার টাকা পয়সা লুট করার জন্য তাকে হত্যা করেছিল'। আর নৈতিকতাপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো: "সে কথা দিয়েছিল"। যা হোক, ব্যক্তি আচরণের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা অবশ্য মনোবিজ্ঞানের বিষয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে একটি নীতিবিজ্ঞানেরও বিষয়। কারণ, এর সাথে নৈতিক শিক্ষা, আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যের আচরণে প্রভাব বিস্তার করার বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা জানি যে, মানুষের আচরণ তার পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই কারো আচরণে পরিবর্তন আনার জন্য তার পারিপার্শ্বিক

---

to be right and wrong, as distict from descriptive ethics, which deals with what people do believe to be right and wrong. Hence, normative ethics is sometimes said to be prescriptive, rather than descriptive. Moreover, because it examines standards for the rightness and wrongness of actions, normative ethics is distinct form meta-ethics, which studies the nature of moral statements and from applied ethics, which places normative rules in practical contexts.

৩ Meta-ethics এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Wikipedia তে লেখা হয়েছে: Meta ethics is concerned primaril with the meaning of ethical judgments and or prescriptions and with the notion of which properties, if any, are responsible for the truth or validity thereof.

পরিবেশে পরিবর্তন আনা জরুরী। অবশ্য কেউ যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার প্রয়োজন বা বিশ্বাসের দরুণ এমন আচরণ করে, যা নৈতিকতা পরিপন্থী, তাহলে সে ক্ষেত্রে অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি কেমন সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে বলেই নিয়মাচার (Normative) সম্বন্ধীয় নৈতিকতায় তা প্রভাব বিস্তার করে। এটি ধরেই নেয়া হয় যে, মানুষ যে কাজ করে তা তার মানসিক অবস্থা, বংশগত ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত। এতে আরো আছে, আইন অমান্য করার শাস্তির ভয় ও লোকলজ্জার ভয়। অন্যকে অনুসরণ করার প্রবণতা দ্বারাও মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো কোনো আচরণের কারণ হতে পারে লজ্জা, ঘৃণা, অপরাধবোধ বা অনুতাপের অনুভূতি; আবার কোনো কোনো কাজ মানুষের সহজাত প্রবণতা বা দয়া, অনুকম্পা ও ঘৃণার ফল হিসেবেও প্রকাশিত হয়। কোনো কাজ এমন আছে, যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার ফসল। মানুষের চাহিদা বা অভিরুচিও কোনো কাজের উদ্দীপক হয়ে উঠতে পারে। আবার স্রষ্টাকে মান্য করাও হতে পারে কাজের ফলশ্রুতি। ভয় ও ভালোবাসা এ দুই-ই স্রষ্টাকে মান্য করার জন্য প্রেষণা হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তির যাতে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, যেমন স্রষ্টার ইচ্ছাও হতে পারে কোনো কাজের ফলশ্রুতি। আবার কারো সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশও হয়ে উঠে কোনো কর্মফলের কারণ।

মানব আচরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া; অনেক ক্ষেত্রেই তা দুর্বোধ্য। এমনকি মানুষ তার নিজের আচরণও সহজে ব্যাখ্যা করতে পারে না। ভবিষ্যৎবাচনিক নৈতিকতা (Predictive Ethics) মানুষের আচরণ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বা আগাম ধারণা দিয়ে থাকে। যে আইন বা রীতিনীতি ব্যক্তি ও সমাজের অনুশাসনে প্রভাব বিস্তার করে, সে সম্পর্কে জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে ভবিষ্যৎবাচনিক নৈতিকতা। এছাড়া জ্ঞানের কিছু পূর্বশর্তের উপরও এ নৈতিকতা নির্ভর করে। মানব আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা একটি কষ্টসাধ্য কাজ; কারণ, একজন মানুষ কেমন আচরণ করতে পারে তা নির্ভর করে তার সামর্থ্য দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা, অভিপ্রায় ও বিশ্বাসের উপর। এছাড়া পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব তো আছেই। অন্যদিকে আবার মানুষের বিশ্বাস ও অভিপ্রায় সবসময় একই রকম থাকে না। বিভিন্ন কারণে তাতেও পরিবর্তন দেখা দেয়।

নিয়মাচার সম্বন্ধীয় নৈতিকতার (Normative Ethics) দু'টি অংশ আছে; প্রস্তাবনামূলক এবং বিবেচনামূলক। প্রস্তাবনামূলক বলতে বুঝায়, আমাদের যা করণীয় ও বর্জনীয় এ বিষয়গুলো। যখন বলা হয়, কারো এরূপ বা এরূপ আচরণ করা উচিত। তখন প্রশ্ন জাগে, কেন এরূপ আচরণ করা উচিত? এ প্রশ্নের উত্তরে নানা তত্ত্ব হাজির করা হয়। বস্তুত আচরণ কেমন হওয়া উচিত, তার মানদণ্ড নির্ভর করে আচরণের পরিণতির উপর। এ পরিণতি হতে পারে সন্তোষজনক, আবার চিরন্তনমুখী অথবা এরকম ভাবা যে, একটি

চুক্তির ফলাফল, অথবা এরকম চিন্তা করা যে, এটি আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা এটি প্রাকৃতিক আইনের অনুবর্তী। কোনো ব্যক্তি কিভাবে নিজে এবং অন্যকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে? নিয়ন্ত্রণমূলক নৈতিকতা (Control Ethics) এ প্রশ্নেরই উত্তর দেয়। এ নৈতিকতার মূল প্রতিপাদ্য হলো, সচ্চরিত্র হওয়া, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, খারাপ কাজ ত্যাগে সহায়তা করা এবং সর্বক্ষেত্রেই উন্নতি সাধন করা। এখানে যে নিয়ন্ত্রণ-এর কথাটি বলা হচ্ছে, তা বাহ্যত মনে হতে পারে দমনমূলক, বাস্তবে তা এরকম নয়। এরূপ নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন পন্থায় কার্যকরী করা যেতে পারে। যেমন: বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা, নৈতিকতা মূল্যায়নে পারদর্শিতা অর্জন করা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নৈতিক সমস্যার সমাধান করা, এমন বিশ্লেষণাত্মক ও সৃষ্টিশীল চেতনা জাগ্রত করা, যাতে নীতিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে পারে, নৈতিকতাবোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা জাগ্রত করা ইত্যাদি। এমনকি আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে এ পরিবর্তন আনা সম্ভব।

উল্লেখ্য, নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ফলিত নীতিবিজ্ঞানকে (Applied Ethics) এক করে দেখা উচিত নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফলিত নীতিবিজ্ঞান বলতে নীতিশাস্ত্রীয় তত্ত্বের সাধারণ প্রয়োগকে বুঝায়। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে উপযোগবাদি তত্ত্ব বা কান্টের তত্ত্ব প্রয়োগ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গর্ভপাতের বিষয়টি। ফলিত নীতিবিজ্ঞানে এ বিষয়টি যে দৃষ্টিকোন থেকে দেখে তা হলো, গর্ভপাত কি সঠিক না ভুল তা পর্যালোচনা করা। এক্ষেত্রে, ফলিত নীতিবিজ্ঞান বিষয়টির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, কারণ অনুসন্ধান ও কাজটি অপ্রত্যাশিত হলে তা দূরীকরণের উপায় নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হয় না।

নীতিবিজ্ঞান প্রথমত সম্পর্কিত অধি-নীতিবিদ্যার (Meta Ethics) সঙ্গে, তারপর নিয়মাচারমূলক (Normative) নীতিবিদ্যার সঙ্গে এবং সাম্প্রতিক সময়ে এটি ফলিত নীতিবিদ্যার (Applied Ethics)[৪] সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজন নীতিবান মানুষ এ পদ্ধতিগুলো সমাজ সেবা, পরামর্শ বা পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। এক্ষেত্রে সূফিসাধকদের বিভিন্ন লেখা খুবই উপকারী হতে পারে। নীতিবিজ্ঞানের এ শাখাটিকে অনেক সময় বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) বা সমালোচনামূলক (Critical) নীতিও বলা হয়ে থাকে। অধি-নীতিবিজ্ঞান (Meta Ethics) যে প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তা হলো "ভালো" বলতে কী

[৪] Applied Ethics- এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে Wikipedia তে লেখা হয়েছে, Applied ethics is a disciplined of philosophy that attempts to apply ethical theory to real life situations."

বুঝায়? নৈতিকতাপূর্ণ বিচার কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়? এবং কিভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়? কোনো কিছুর নৈতিক মানের অবস্থান কেমন হবে? নৈতিক ও অনৈতিক বিষয়ের মূল পার্থক্যগুলো কি কি? ইত্যাদি।

নীতিবিজ্ঞানের তত্ত্ব বা ভাষ্য বিভিন্ন পেশা বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষিত লোকের কাছে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ, স্কুল ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী- এরূপ বিভিন্ন পেশা ও পর্যায়ের ব্যক্তির কাছে নীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু উপস্থাপনা বিভিন্নভাবে হতে পারে। কারণ, এসব বিষয়ে গূঢ়ার্থ ও জটিল ব্যাখ্যা সকলের কাছে সমানভাবে বোধগম্য নাও হতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তুও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের কাছে উপস্থাপিত হয়, তবে সকলের কাছে তা অভিন্ন একটি সাধারণ অর্থই প্রকাশ করে। যদিও ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে এর মর্মার্থ ভালো বুঝতে পারে।

নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এসব আলোচনার পরিশেষ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, নীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলোর দু'টি দিক আছে; একটি হলো এর গুণবাচক দিক এবং অপরটি হলো ক্রিয়াবাচক দিক। গুণবাচক দিক নীতিসম্বন্ধীয় বিষয়ের গুণগত দিক ও এর বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে, অন্যদিকে ক্রিয়াবাচক দিক নীতিসম্বন্ধীয় বিষয়ের বাস্তবায়নের প্রকৃতি ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করে। গুণবাচক বিষয় নীতিকে একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে, যেমন, সূফীসাধকের জীবন। একজন সূফীসাধক জীবনকে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। কাজেই নৈতিকতা তার গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক উভয় দিক নিয়েই পূর্ণতা লাভ করে এবং সামগ্রিক নৈতিকতা ব্যক্তির কর্মকাণ্ড, আচরণ, কাজের ফলাফল, অনুভূতি, আবেগ, উদ্দেশ্য-অভিপ্রায়, নীতিমালা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ সকল কিছুকে নিয়েই গড়ে উঠে।

ইসলামী নীতিবিজ্ঞান

ইসলামী নীতিবিজ্ঞান একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কতগুলো মৌলিক সূত্রের নিয়মতান্ত্রিক ও তাত্ত্বিক কাঠামোবদ্ধ আলোচনার ভিত্তিতে। পবিত্র কুরআন ও বিবিধ হাদীসগ্রন্থ ছাড়াও ইসলামী আইনশাস্ত্র, ইসলামী সাহিত্য ও সুফি দর্শনে ইসলামী নীতিবিজ্ঞানের অনেক বিষয়বস্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নিচে এর কিছু চুম্বক অংশ আলোচনা করা হলো।

ইসলাম পূর্ব-যুগে সমাজের নীতিনৈতিকতা

পবিত্র কুর'আনের নৈতিক বিধিমালা বুঝার ক্ষেত্রে একটি উত্তম সূচনাসূত্র হতে পারে ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজের নৈতিকতা সম্পর্কে জানা। ইসলামপূর্ব যুগেও পৌত্তলিক আরব জনগোষ্ঠীর মাঝে অনেক সৎ গুণ বিদ্যমান ছিলো। যেমন সত্যবাদিতা, মেহমানদারি, ওয়াদাপূরণ ইত্যাদি। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে আরব

সমাজকে বলা হত জাহিলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ। এ প্রসঙ্গে Godziher অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জাহিলিয়া শব্দের অনুবাদ অজ্ঞতার পরিবর্তে বর্বরতা হওয়াই শ্রেয়। কারণ, মুহাম্মাদ ﷺ ইসলামের বিপরীতে বর্বরতার কথাই উল্লেখ করেছেন, অজ্ঞতার নয় (Goldziher 1967, 1/202)। যুক্তি দিয়ে বলা যায়, জাহিলিয়া শব্দটি আরবি جهل থেকে উদ্ভূত। এর অন্য একটি অর্থ হলো, অযাচিত ও বেপরোয়াভাবে খুব অল্পতেই রেগে যাওয়া, যা পৌত্তলিক আরবদের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল। جهل শব্দটির বিপরীত শব্দ হলো حلم যার অর্থ সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, স্থৈর্য, ক্রোধান্ধতামুক্ত হওয়া, শান্ত ও কোমল প্রকৃতির হওয়া ইত্যাদি। একজন হালিম বা শান্ত ও কোমল প্রকৃতির মানুষ ক্রোধান্ধ মানুষের চেয়ে বেশি সভ্য। পৌত্তলিক আরব সমাজ 'হিলম' ও 'জাহল' এই দুই বৈশিষ্ট্যের টানাপোড়নে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। একদিকে তারা রক্ত গরম করা ক্রোধে কুপিত ছিল, অন্য দিকে স্থৈর্যতার গুণটির প্রতিও তাদের ছিল মোহমুগ্ধতা।

পৌত্তলিক আরব গোষ্ঠীর এরূপ বেপরোয়া ক্ষিপ্ততার কথা পবিত্র কুরআনেও বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা, অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের মাঝে আপন প্রশান্তি দান করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন (Al-Qurān, 48:26)।

এ আয়াতে حمية الجاهلية বলতে আরব উপজাতির উদ্ধত আচরণের কথা বলা হয়েছে। আরবের এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইসলাম পূর্ব যুগে গোত্রে-গোত্রে বিবাদ বিসংবাদ লেগেই থাকতো। পবিত্র কুরআনে এরূপ উদ্ধত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিপরীত শান্ত ও কোমলতার ধর্মসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। আরব সমাজের এরূপ রগচটা রাগী স্বভাবের সঙ্গে পৌরুষত্বের তুলনা করা হতো। মুহাম্মদ ﷺ-ই আরবের বুকে প্রথম মানব, যিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যে, ক্ষমা প্রদর্শন কোন হীন বিষয় নয়; বরং এটি নৈতিক উৎকর্ষের প্রতীক; বস্তুত তা পৌরুষত্বের সবোর্চ্চ পরাকাষ্ঠা।

আল-কুরআনের নীতি-নৈতিকতা

ইসলামী নীতিবিজ্ঞান বলতে যা বুঝায়, তা ধর্মীয় বা দার্শনিক যে দৃষ্টিকোণেই দেখা হোক না কেন, চূড়ান্ত পর্যায়ে তা কুরআনের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। অনেক মুসলিম দার্শনিকই গ্রিক দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব ধারণাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেউ কেউ আবার নীতি সম্বন্ধীয় কুরআনের বিভিন্ন বাণীকে গ্রিক

দর্শনের আলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। কাজেই নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এরূপ উদ্যোগকে বিচার-বিশ্লেষণ ও স্বাগত জানানোর আগে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নীতিদর্শনের স্বরূপটি কেমন, তা প্রথমেই ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। যদিও কুরআনী নীতিদর্শনের উপর খুব বিস্তারিত পরিসরের কোন গবেষণা আধুনিক সময়ে দেখা যায় না, তথাপি কুরআনের বিভিন্ন শব্দ ও পরিভাষাগত এবং ধর্মতত্ত্বগত গবেষণার একটি ভিত্তি ফজলুর রহমান এবং জর্জ হৌরানির (George F. Hourani) লেখায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফজলুর রহমান রচিত Major thems of the Quran এবং হৌরানি রচিত Ethical presuppositions of the Quran এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

উল্লেখ্য, আল কুরআনের নীতিদর্শনগত দিকটি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সামাজিক পেক্ষাপটের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এ সামাজিক প্রেক্ষাপটে পৌত্তলিক আরবগোষ্ঠী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম যুগের সাহাবা উভয় পক্ষই অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ধর্মীয়, আইনগত এবং নৈতিক বিষয়গুলো পরস্পর সম্পর্কিত। কারণ, এসবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন। এছাড়াও এর একটি পরম কারণমূলক (Teleological)[৫] দিকও রয়েছে, কুরআনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে মান্য করে এবং কায়মনোবাক্যে তাঁর সান্নিধ্য যাচঞা করে যাতে শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় এবং নিজেকে গোটা মানবতার শ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় (Reinhart 2017, 108)।

আল-কুরআনের আলো আরব জনগোষ্ঠীর চিত্তকে রঞ্জিত করে এবং তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ উত্তপ্ত মনোভাব থেকে ক্রমেই ধীর ও স্থির মনোভাবে নিজেদের পরিবর্তন করে। ইসলাম-পূর্ব যুগের জাহল ও হিলম মেরুকরণটি ক্রমেই পবিত্র কুরআন অবর্তীণ হওয়ার পর পরিবর্তিত হয় "কুফর ও ইসলাম" এই দুই মেরুকরণে।

যে ব্যক্তি 'হিলম' বা 'ধীর-স্থিরতা' গুণসম্পন্ন, তিনি স্বনিয়ন্ত্রিত, পরিমিতিবোধ সম্পন্ন ও বদান্যতাপূর্ণও বটে। ইয়ুতসুরের মতে, পবিত্র কুরআনে 'হিলম' নামক গুণটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে, যা শুধু মানুষ-মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; মানুষ ও স্রষ্টার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়। 'হিলম' গুণবাচক প্রত্যয়টি আল্লাহ তায়ালার সুন্দরতম নামেরও একটি। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় 'হিলম' গুণ দ্বারা মানুষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে (Izutsu 1959, 216).

পবিত্র কুরআনে 'হিলম' গুণটির চিত্র ফুটে উঠেছে নিচের আয়াতে:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.

---

[৫] Teleology শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Telos' থেকে নির্গত। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, A teleological school of thought is one that holds all things to be designed for or directed toward a final result, that there is an inherent purpose or final cause for all that exists (Mahner & Bunge 1997, 367)

"রহমান' এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম (Al-Qurān, 25: 63)।

সামাজিক দৃষ্টিকোণে 'হিলম' একটি মহান নৈতিক গুণের নাম। অধিবিদ্যাগত (Metaphysically) দৃষ্টিকোণে, মানুষ আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে; অপর কোন মানুষের উদ্দেশ্যে নয়। কাজেই 'হিলম' ইসলামের একটি অন্যতম সামাজিক গুণ (Virtue)। মুসলমানরা শুধু তাদের উত্তম চরিত্রগুণেই সাহস ও সম্পন্নতা অর্জন করতে পারে না, তা অর্জিত হয় বান্দা ও স্রষ্টার সম্পর্কের ভিতের উপর।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য নৈতিক গুণাবলী, যা 'হিলম' গুণসঞ্জাত তার একটি ক্ষুদ্র তালিকা ইয়াসীন মুহাম্মদ তার The Evolution of Early Islamic Ethics প্রবন্ধটিতে (Donaldson) এর একটি লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে ধরেছেন (Mohamed 2001) যেমন স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব ৮:১, পরিমিতিবোধ ২:১৯০, ক্ষমাশীলতা ৫:১৯৯, নম্রতা ১৭:৩৯, সততা ১৭:৩৭, দানশীলতা ২৪:২২ এবং আস্থাভাজনতা ৫:১ ইত্যাদি। যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআনে নিন্দিত হয়েছে, সেগুলো হলো: অহংকার ৩১:১১-১৭, ধর্মবিরুদ্ধতা ৩৩:৫৭ এবং অপবাদ বা মিথ্যা কলঙ্ক ৩৩:৩৮ (Donaldson 1953, 14-17)।

'হিলম' حلم গুণবাচক প্রত্যয়টি দ্বারা পবিত্র কুরআনের আরো যে শিক্ষা পাওয়া যায়, সে আয়াতগুলো নিচে বিবৃত হলো:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ

ইব্রাহিম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয় ও সতত আল্লাহ অভিমুখী (Al-Qurān, 11:75)।

অন্যত্র, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ - وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ - وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.

হে বৎস। সালাত কায়েম কর, সৎকর্মের নির্দেশ দাও, আর অসৎ কর্মে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ কর, এটাতো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকার বলে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি সংযতভাবে চল এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর; নিশ্চয়ই গর্দভের সুরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর (Al-Qurān, 31:17-19)

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশ-পাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন (Al-Qurān, 3:159)।

'খাইর' এবং 'বির'

'হিলম' গুণবাচক নৈতিকতা ছাড়াও পবিত্র কুরআনে আরো যে নৈতিক গুণের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে তা হলো خير (ভালো)। এ গুণটি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই যা মূল্যবান, উপকারী ও কাঙ্ক্ষিত তাকে বুঝায়। خير শব্দটি আবার ক্ষেত্রেবিশেষে সম্পদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনে এরূপ অর্থদ্যোতক যে আয়াত বর্ণিত হয়েছে তা হলো:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, বল, যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা করো না কেন, আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে অবহিত (Al-Qurān, 2:215)।

خير দ্বারা ধর্মীয় অনুশীলনকেও বুঝায়। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, নিষেধ কর অন্যায়ে এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর। কিতাবধারীগণ যদি বিশ্বাস করত তবে তাদের জন্য ভালো হতো, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে; কিন্তু অধিকাংশই সত্যত্যাগী (Al-Qurān, 3:110)।

'খাইর গুণবাচক প্রত্যয়টির বিপরীত হলো 'শার'। পবিত্র কুরআনে এ প্রত্যয়টির ব্যবহার এসেছে নিম্নরূপে:

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ .

আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে (Al-Qurān, 21:35)।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আরো একটি নৈতিক গুণ হলো 'বির' বা ন্যায়পরায়ণতা। এ গুণটি ধর্মভীরুতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ভালোবাসা এ তিনটি গুণের একটি সমষ্টি। পবিত্র কুরআনে এই গুণ সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে:

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই: কিন্তু পুণ্য আছে কেউ পরকাল, ফিরিশতা, কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহর প্রেমে আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রামে-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী" (Al-Qurān, 2:177)।

হাদীসশাস্ত্রের নীতি-নৈতিকতা

পবিত্র কুর'আন মানুষকে শুধু বিশ্বাস স্থাপনের কথাই বলেনি, বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ ও নৈতিক আচরণেরও নির্দেশ দিয়েছে, যাতে মানুষ মহান স্রষ্টার প্রিয়ভাজন হতে পারে। যেহেতু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কেই আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, কাজেই আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এছাড়া, পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ ও বান্দা এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হবে- এ প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সকল কাজ, চিন্তা ও আচরণের প্রমিত মাপকাঠি হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই একমাত্র আলোকময় দিশারী। পবিত্র কুর'আনের বর্ণনামতে, তিনি নৈতিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ব্যক্তি এবং ধার্মিকতা ও ধর্মভীরুতায় অনুপম আদর্শ।

হাদীস শাস্ত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নৈতিক জীবনের বিস্তারিত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। পবিত্র কুর'আনের মতো হাদীস শাস্ত্রেও মানুষের করণীয় কর্তব্য, আনুষ্ঠানিকতা, সামাজিক আচরণ, সম্পর্ক এবং পূর্ণ বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় উপাত্তগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মোদ্যোগ, তাঁর বাণী ও উপদেশ এবং নীরব সম্মতির বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে।[৬]

[৬] J. Robin. Encyclopedia of Islam", New edition. P.23-28; Donaldson, "Studies in Muslim Ethics". P. 60

এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা ও আদর্শ জীবনীগ্রন্থেও (সিরাত) বিবৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম ব্যবহার, নৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিমনস্কতা ইত্যাদি বিষয় আরো জানা যায় আদব বা শিষ্টাচার সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে। Wensinck রচিত A handbook of Early Muhammadan Tradition গ্রন্থে এরূপ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন, বিশ্বাস, প্রার্থনা, ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য, নাগরিক দায়িত্ব, অপরাধ আইন, নৈতিক সতর্কতা সঙ্কেত, এবং ব্যক্তিগত রুচি ইত্যাদি। নৈতিক সতকর্তার আলোচনায় জ্ঞানার্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া উত্তম মেজাজ, অন্যায় বা মন্দ সবকিছু বর্জন, ভালো জিনিস গ্রহণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৈতিক চরিত্র ও গুণাবলি ধারণ ও বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এছাড়াও উক্ত গ্রন্থে অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি বাধ্যবাধকতা, বাণিজ্য ও ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং ঋণ আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত রুচি বা অভ্যাসের ক্ষেত্রে অনেক সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ ও হাদীসে।

খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, অভিবাদন জ্ঞাপন, শিশু লালন পালনে সঠিক অনুশীলন ইত্যাদি বহু বিষয়ে সুন্নাহ সমর্থিত নির্দেশনা হাদীসগ্রন্থগুলোতে বিবৃত হয়েছে। নীতিনৈতিকতার অন্যান্য যে বিষয়গুলোর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা হলো মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অপব্যয়ী না হওয়া এবং অর্থব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, আতিথেয়তা, ধৈর্যশীলতা, মানুষের বিশ্বাস ভরসা বজায় রেখে চলা ইত্যাদি। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নৈতিক জীবনের পূর্ণ অনুসরণ মুসলিম জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী গ্রন্থ থেকেও তাঁর নৈতিক জীবনের অভ্যাস, ভাবনা ও প্রবণতাগুলো জানা যায়। এক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ হলো ইবনে হিশাম [২১৮ হিজরী, ৮৩৩ খ্রী.] রচিত "কিতাবু সিরাতি রাসূলিল্লাহ" ও ইবনে সা'দ [২৩০হি.] রচিত "আল-তাবাক্বাত"। এ গ্রন্থদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনের যে নৈতিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো, সহনশীলতা (حلم), উদারতা (سخاء), সাহস (شجاعت), ধৈর্যশীলতা (صبر) এবং উত্তম আচরণ (حسن الخلق) ইত্যাদি। নিম্নে হাদীস শাস্ত্রে সংকলিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীতি নৈতিকতা বিষয়ক কিছু বাণী উদ্ধৃত করা হলো। আনাস রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অপরের জন্য পছন্দ করবে ঐ জিনিস যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে (Al-Bukhārī 2002, 14, 13)।

দান ও কার্পণ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষা নিম্নরূপ:

الجاهل السخي احب إلى الله من عابد بخيل.

যে ব্যক্তি দান করে কিন্তু মূর্খ, এ লোকটি আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয় ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে ইবাদত করে কিন্তু কৃপণ (Al-Tirmidī 1417H, 446, 1961)।

লজ্জাশীলতা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, মহানবী ﷺ এক আনসারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

دعه فان الحياء من الايمان.

তাকে (তার অবস্থায়) ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ (Al-Bukhārī 2002, 24, 16)

ঘৃণা ও হিংসা বর্জন এবং ভ্রাতৃত্ববোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا.

তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, হিংসা করো না, একে অপরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না; হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও (Al-Bukhārī 2002, 1521, 6076)।

মুসলমান একে অপরের সাহায্য সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ইহজাগতিক কোন বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দিবেন (Al-Tirmidī 1417H, 440, 1930)।

প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মহানবী ﷺ এরশাদ করেন।

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার প্রতিবেশিকে কষ্ট না দেয় আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার অতিথি আপ্যায়ন করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন ভালো কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে (Al-Bukhārī 2002, 1509, 6017)।

ক্ষমা ও দয়াশীলতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يرحم الله من لا يرحم الناس.

আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না (Al-Bukhārī 2002, 1821, 7376)।

রাগ বা ক্রোধ দমনের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

من كظم غيظا وقادر أن ينفذه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره فى أي الحور شاء.

যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সৃষ্টিকুলের মাঝে ডাকবেন এবং যে কোন হুরকে গ্রহণ করার ইচ্ছাধিকার প্রদান করবেন (Al-Tirmidī 1417H, P-457, N-2021)।

ন্যায় ও অন্যায়ের সংজ্ঞায়নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষা নিম্নরূপ:

البر حسن الخلق والأثم ما حاك فى صدرك وكهرت أن يطلع عليه الناس.

ন্যায় হলো উত্তম চরিত্র (নৈতিকতা) আর অন্যায় হলো যা তোমার মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং তুমি মানুষকে সে সম্পর্কে অবহিত করতে অপছন্দ কর (Muslim 2006, 1190, 2553)।

বস্তুত ইসলামের নৈতিক উৎকর্ষ বিষয়ক জ্ঞান ও ইসলামী আইনের প্রধান ও প্রাথমিক উৎস হলো আল-কুরআন ও হাদীস। এ থেকে উৎসারিত নিয়ম নীতি ও রীতিপদ্ধতিকে বলা হয়ে থাকে ফিকহ। সুফি সাধক ও অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান শুধুমাত্র ফিকহ শাস্ত্র চিহ্নিত রীতি পদ্ধতি অনুসরণকেই মুখ্য মনে করেন না। তাদের মতে, কোন বিষয়ে বা কাজে অনুমোদনের প্রশ্নে সুন্নাহর অন্তর্নিহিত চেতনার দিকটিও খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী নীতিবিজ্ঞান: সামগ্রিক চোখে

ইসলামের প্রধান দুই উৎস, কুরআন ও হাদীসে নীতি ও নৈতিকতার উপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ দুই সূত্রমতে নৈতিকতাই ইসলামী জীবনধারার প্রধান লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে যে বার্তা নিয়ে এসেছেন, তার মূল শিক্ষাও নীতিনির্ভর।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি (Al-Qurān, 21:107)।

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আলাহ তা'য়ালা বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী (Al-Qurān, 68:3)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

انما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق

আমি সচ্চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি (Al-Bukhārī 1989, 104, 273)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন:

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا.

যার চরিত্র উত্তম সেই পরিপূর্ণ মুমিন (Al-Tirmidī 1417H, 589, 2612)।

সমসাময়িক নীতিবিজ্ঞানে মুসলিম অন্বেষা

বর্তমান সময়ে ইসলামী নীতিবিজ্ঞান নিয়ে যেসব গবেষণা পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য গবেষক হলেন, আব্দুল্লাহ দ্রাজ, আব্দুল হক আনসারী, তোশিহিকো ইয়ুতসু, ফজলুর রহমান, হৌরানি, মাজিদ ফাখরে, আহমাদ আব্দুর রহমান ইব্রাহীম, আহমাদ মাহমুদ সুভী, রফিক ইসা বেকুন এবং ড্যানিয়েল এইচ ফ্রাংক প্রমূখ। ইসলামী নীতিবিজ্ঞানের সমকালীন আলোচনায় আব্দুল্লাহ দ্রাজ রচিত "দাসতুরুল আখলাক ফিল কুরআন" গ্রন্থটি একটি মাইলফলক। তিনি কুরআন নিঃসৃত একটি নৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন (Darrāj 1982, 8-9)। এছাড়া তিনি পশ্চিমা দর্শন, মুসলিম পণ্ডিতদের ভাষ্য ও কুরআনের বক্তব্যের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন (Ibid, 17-18)। তার মতে নীতি বিজ্ঞানের পাঁচটি ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। এক. বাধ্যবাধকতা, দুই; দায়িত্ব, তিন. নীতিগত অনুমোদন, চার. অভিপ্রায় প্রেষণা, এবং পাঁচ. প্রচেষ্টা। এর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হলো, বাধ্যবাধকতার ধারণাটি। এর মূলে প্রোথিত আছে ফিতরত বা সহজাত প্রবণতা, কুরআনি প্রত্যাদেশ ও স্বাধীনতা (Ibid, 16) এবং এ তিনটি ধারণার মধ্যে সমন্বয় সাধন। দ্রাজ বলেন, নৈতিক আইন– বাস্তব ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও প্রয়োগযোগ্য।

আব্দুল্লাহ দ্রাজ এর মতে, নৈতিক আইন কখন প্রয়োগযোগ্য সে ব্যাপারে কোন কিছু নির্ধারিত নেই; অবশ্য এই অনির্ধারণী বৈশিষ্ট্য নৈতিক আইনকে অমান্য করতে সহায়তা করে না। আব্দুল হাক্ব আল-আনসারীর গবেষণাপত্র Islamic Ethics concept and prospectis (Al-Ansarī 1989)-এ মুসলিম মনীষীদের (দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, সুফি সাধক, আইন তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের লেখক) অবদানের উপর একটি সুন্দর ভূমিকা রচিত হয়েছে। Islamic Ethics "শিরোনামে রচিত তার একটি অপ্রকাশিত লেখায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নৈতিকতা সম্বন্ধীয় ধারণাগুলো তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ লেখায় পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নৈতিক ধারণাসমূহ, দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার আইন কানুন এবং দায়িত্ব পালনে দ্বান্দ্বিকতার বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেছেন।

ফজলুর রহমান তার Law and Ethics in Islam গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সত্যিকার অর্থে সর্বাবস্থায় সকল নীতিমালা ও নিয়মকানুন সমগ্র কুরআন থেকেই আহরণ করা সম্ভব। তিনি বলেন, মূল্যবোধকে একটি নিয়মের শৃঙ্খলে বন্দী করার জন্য মুখ্য নিয়মকানুনগুলোর সত্বর প্রয়োগ দরকার। তার মতে, এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন মত ও মতানৈক্যকে সুবিন্যস্ত করা সম্ভব (Rahman 1985, 16)।

তোশিহিকো ইয়ুতসু ইসলামী নীতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং পরবর্তী পণ্ডিতগণ সে পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। ফজলুর রহমানের মতো তোশিহিকো মনে করেন যে, কুরআনে নৈতিকতার

শিক্ষাগুলোকে একটি প্রমিত পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। তোশিহিকো যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, তা' হলো, Let the Quran speak for itself (Izutsu, 1966) তিনি নৈতিকতাকে তুলনামূলক মানদণ্ডে দেখতে চেয়েছেন এবং কুরআনের ভাষার উপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে একই শব্দ বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। এ শব্দমালা কি উদ্দেশ্যে কি অর্থদ্যোতনা নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে- তা সব কিছু এক জায়গায় জড়ো করে, পারস্পরিক তুলনা করে এসব আরবী শব্দমালার একটি প্রকৃত সংজ্ঞা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাস্তবতা সবসময়ই একটি আদর্শ রূপ ধারণ করে। তোশিহিকো পবিত্র কুরআন অনুধাবনের কতিপয় পদ্ধতিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। তিনি বলেন:

> We have good dictionaries, much philosophical work has been done, and in the domain of Quranic exegesis, in particular we are provided with authoritarive commentaries. For theoretical reasons, however our methodological principles forbids us to rely too heavily on these secondary sources we must not forget that they may prove more misleading thean enlightening.

তোশিহিকোর পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো বের হয়ে আসে:

এক. পবিত্র কুরআন নিজেই তার নীতিমালা পরিস্ফুটনে যথেষ্ট।

দুই. শুধু কুরআন পঠনের মাধ্যমেই কুরআনের বিস্তারিত অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। কুরআনেই উল্লেখিত হয়েছে, মহানবী ﷺ-কে এর ব্যাখ্যার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মুসলিম মনীষীরা কুরআনের সঠিক অর্থ অনুধাবনের জন্য কিছু নির্দেশনার কথা বলেছেন। যেমন, (ক) কুরআন নিজের অর্থ প্রকাশে সক্ষম (খ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ কুর'আনের ব্যাখ্যাস্বরূপ (গ) পবিত্র কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট (আসবাবে নুযূল) খুবই গুরুত্বপূর্ণ (ঘ) আরবী ভাষা, সাহিত্য ও এর ব্যাকরণ পবিত্র কুরআনের অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। (ঙ) কুরআন ব্যাখ্যাকারীর (منسوخ) রহিত আয়াতগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী (Zaroug, 1993, 3)।

আহমাদ ইব্রাহীমের গ্রন্থ 'আল-ফাযায়িলুল খুলুকিয়্যাহ ফিল ইসলাম'-এ ইসলামী নীতিশাস্ত্রের উপর সমৃদ্ধ আলোচনা এসেছে। এছাড়া, আহমাদ মাহমুদ সুবহীর "আল-আখলাকিয়াহ ফিল ফিকরিল ইসলামী" গ্রন্থে ধর্মতাত্ত্বিক, সুফিসাধক ও দার্শনিকদের অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে, যদিও গ্রন্থটিতে ইসলামী আইন শাস্ত্রের নৈতিকতা বিষয়ক কোন আলোচনা স্থান পায়নি।

ইসলামী নীতিবিজ্ঞান নিয়ে হৌরানি Reason and Tradition in Islamic Ethics শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ (Hourani 1985) লিখেছেন। যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি

আবর্তিত, তা হলো, নৈতিক সত্য কি আল্লাহর প্রত্যাদেশ ছাড়া বুঝা সম্ভব? হৌরানি অবশ্য নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার গ্রন্থটি সামগ্রিকভাবে ইসলামী নীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নয়। এতে শুধু ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক নীতিশাস্ত্রীয় বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে, সুফিবাদ থেকে বিভিন্ন ঘটনা উদাহরণ হিসেবে স্থান পেয়েছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, হৌরানির মতে, Normative ethics এর চেয়ে Meta-Ethics বেশি মূল্যবান। এমনকি সমকালীন নীতিবিজ্ঞানের দার্শনিকগণও একই মত পোষণ করেন। হতে পারে এর জন্যই হৌরানি বিশ্লেষণাত্মক নীতিবিজ্ঞানের আলোচনার দিকে বেশি মনোযোগী হয়েছেন। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এবং দার্শনিকগণ আবারো Normative ethics ও Substantive Ethics এর দিকে বেশি আগ্রহ বোধ করেছেন, বিশেষ করে এর গবেষণাকীর্তির পর।

তোশিহিকোর মতো হৌরানীও মনে করেন, কুরআনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের জন্য কুরআন ভাষ্যকারদের বিশ্লেষণের চেয়ে বরং ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রেক্ষাপটে কুরআনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। কুরআনের শব্দ ও বাক্যাবলির প্রমিত ব্যাখ্যার জন্য আরবেরী (Arberry) ব্ল্যানচেয়ার (Blanchere) এবং প্যারেট (Paret) এ তিনজন প্রাচ্যবিদের অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী নীতি-নৈতিকতা বুঝার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরেকটি পদ্ধতি হলো, পবিত্র কুরআনের عدل ও ظلم এ দু'টি ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। হৌরানীর মতে, عدل প্রত্যয়টি বুঝার জন্য সুন্নাহ্ ও শানে নুযুল ছাড়াও কুরআনের সামগ্রিক দর্শনের প্রতি দৃষ্টি প্রদান গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন প্রত্যয়ের প্রকৃত অর্থ ভাষাতাত্ত্বিক ধারার অর্থের বিপরীতও হতে পারে। পবিত্র কুরআন থেকে عدل শব্দটির নিম্নলিখিত তিনটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

এক. عدل এমন গুণবাচক বৈশিষ্ট্য, যা একজন ভালো মানুষই নির্ধারণ করতে পারে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা সকল ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়েছেন, এরূপ আদেশের অনুসরণ যৌক্তিক ও ভালো মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

দুই, পবিত্র কুরআনে সাধারণ প্রয়োজন বা কোন কিছুর গুণ বিচার অথবা সংস্কার বা শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

তিন.এটি কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম-কানুনকেও বুঝাতে পারে। যেমন, উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের নীতি, যাকাত প্রদানের নীতি ইত্যাদি।

মজিদ ফাখরে তার Ethical theories in Islam গ্রন্থে ইসলামী নীতিবিজ্ঞানের একটি চমকপ্রদ শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। যেমন, কিতাবি নৈতিকতা (Scriptual Ethics) ধর্মতাত্ত্বিক নৈতিকতা (Theological ethics) দার্শনিক নৈতিকতা (Philosophical ethics) এবং ধর্মীয় নৈতিকতা (Religious ethics)। কিন্তু তিনি ইসলামী

আইনশাস্ত্রের নৈতিকতা নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি, যা নীতিবিজ্ঞানের একটি উর্বর ভূমি হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারে। তিনি এমনকি সুফিবাদী নৈতিকতারও বিস্তারিত আলোচনা করেননি। কারণ, তার মতে আল-গাযালীর কীর্তি ছাড়া সুফিবাদী দর্শন তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বস্তুত সুফি দর্শন ইসলামী নীতিবিজ্ঞানের আলোচনায় অত্যন্ত উচ্চমানের একটি দর্শন (Fakhrī 1991)।

নীতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত ফ্রাঙ্কের (Frank 1996) অধ্যায়টি দার্শনিক নীতিবিজ্ঞানের কতিপয় বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন, মানবীয় সদগুণের প্রকৃতি এবং এর সঙ্গে রাজনৈতিক শৃঙ্খলার সম্পর্ক। যদিও আলোচ্য অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একটি মানসম্পন্ন বইয়ের অধ্যায় হিসেবে এটি আরো সমৃদ্ধ হতে পারতো বলে আবদুল্লাহ্ হাসান জারোগ মন্তব্য করেছেন (Zaroug 1999, 59)। এছাড়া ইসলামের ফলিত নীতিবিজ্ঞান বিষয়ে রফিক ইসা বেকুন রচিত Islamic Business Ethics গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন (Beekun 1997)।

নীতিবিজ্ঞান ও আইন

নীতি-নৈতিকতা ও আইনের সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয় তা হলো, নৈতিকতাকে কি আইন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা উচিত? নৈতিকতা ও আইনের মধ্যে পার্থক্য কী? এ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কই বা কতটুকু? বলা বাহুল্য নৈতিকতা ও রাষ্ট্রীয় আইন পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত। আইন ও নৈতিকতার মূলগত পার্থক্য নিম্নের ছকের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে:

সূচক	আইন	নৈতিকতা	নৈতিক মূল্যবোধ
সংজ্ঞা	সুশাসনের জন্য প্রণীত বাধ্যতামূলক নিয়ম ও রীতি।	প্রমিত আচরণমালা, নীতি ও ব্যবহারবিধি।	পরিবার, সংস্কৃতি ও সমাজের প্রভাবে বিশ্বাসের ভিত্তি রচিত হয়।
প্রধান উদ্দেশ্য	জনস্বার্থ রক্ষা করা।	যোগ্যতা ও সক্ষমতার মাত্রাগত প্রবৃদ্ধি।	ব্যক্তিগত পর্যায়ে নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।
মাপকাঠি	সমাজের স্বাভাবিক গতি ত্বরান্বিত করা।	মূল্যবোধ ও আদর্শ গঠন করা।	ব্যক্তিগত নৈতিক বিধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
বিধিভঙ্গের দণ্ড	ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা-অপরাধ প্রমাণিত হলে জরিমানা, জেল, লাইসেন্স বাতিল অথবা আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত যে কোনো শাস্তি।	সমাজবিচ্যুতি, একঘরে হওয়া।	লোকনিন্দা, অন্যের সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষীণ সম্ভাবনা।

সূত্র: ক্যারেন জাডসন ও শ্যারণ হিক্স রচিত Law & Ethics for Medical Careers গ্রন্থ থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত, পৃ. ৭

এমন অনেক বিষয় আছে, যা নৈতিকতা ও রাষ্ট্রীয় আইন দুই মানদণ্ডেই নিষিদ্ধ, যেমন, চুরি করা বা হত্যা করা। আবার এমন অনেক বিষয় আছে, যা নৈতিকতার মানদণ্ডে নিন্দনীয় হলেও আইনের চোখে অপরাধযোগ্য নয়। যেমন, নিকটাত্মীয় অসুস্থ হলে তাকে দেখতে না যাওয়া অথবা কারো সালাম বা সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর না দেয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলা।

কোন্ কাজ আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য আর কোন্ কাজ শাস্তিযোগ্য নয়- সে প্রশ্নে মতানৈক্য রয়েছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট হার্ট মনে করেন, নৈতিকতাকে আইন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা ঠিক নয়। তাদের মতে, আইন সেসব ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য, যেসব ক্ষেত্রে কোন কাজ অপরের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। যেসব কাজ অপরের জন্য অনিষ্টকর নয়, যদিও বা কাজটি দৃষ্টিকটু বা সাধারণভাবে অগ্রহণযোগ্য, সেসব ক্ষেত্রে মিল ও হার্টের মতে, উক্ত কাজের কর্তাকে অপরাধী মনে করা সমীচীন নয়। উদারণস্বরূপ, সমকামিতার কথা উল্লেখ করা যায়। কারো কারো মতে, সমকামিতা শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ নয়। ১৯৬০ এর দশকে সমকামিতার গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে লর্ড ডেভলিন ও হার্টের মধ্যে তুমুল বির্তর্কের সূত্রপাত হয়। এতে লর্ড ডেভলিন (Devlin 1970) নৈতিকতার সমর্থনে জোরালো অবস্থান নেন, অন্যদিকে হার্ট মত দেন এর বিপক্ষে (Hart 1963)। আবার অপরাধীকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যই শাস্তি দেয়া উচিত এমন ধারণার বিপক্ষে মত দেন মিল ও তার অনুসারীগণ (Mill 1859)। তবে ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তি অন্যায় দমন করে বলেও মত দেন তারা।

আমরা জানি, আইনের অনুসরণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলক; কিন্তু নৈতিকতার অনুসরণ সে অর্থে অবশ্যপালনীয় নয়, এটি কার্যত একটি ঐচ্ছিক ব্যাপার। নৈতিকতা অবলম্বনের পেছনে মানুষের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় কাজ করে; অন্যদিকে আইন সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপও করে না। একটি উদাহরণ দেয়া যাক, একজন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে মানুষকে খুশি করার জন্য হয়তো যাকাত দেয়। আইনের চোখে এটি বৈধতা পেয়ে যাবে এবং পুনর্বার তাকে যাকাত আদায় করতে হবে না। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের অভিপ্রায়ে যাকাত আদায় করা মূল্যহীন হয়ে পড়তে পারে। কারো কারো মতে, সমাজে প্রচলিত নৈতিক বিধির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় আইন প্রণীত হওয়া উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সামাজিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নৈতিক বিধির চেয়ে আইন আরো বেশি প্রগতিশীল হতে পারে। কোন্‌টি নীতি আর কোন্‌টি নীতি নয় এবং কোনো কাজ, অবস্থান ও ধারণা কি কি শর্তসাপেক্ষে নীতিগত হয়ে উঠে, এটি চিহ্নিত করার জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। যেমন:

এক. অনৈতিক আচরণ থেকে নৈতিক আচরণকে আলাদা করার জন্য ভালো, মন্দ, উচিত এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এর অসুবিধা হলো, এ শব্দগুলো নীতিসম্বন্ধীয় আলোচনার বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন,

এটা খুব 'ভালো গাড়ি' অথবা সেতুটি এভাবে তৈরি করা উচিত ছিল। তথাপি এসব ক্ষেত্রে বক্তব্যের প্রসঙ্গ ও পটভূমি বিশ্লেষণ করে বুঝা যায়, বক্তব্যটি নীতিসম্বন্ধীয় নাকি নীতিবিজ্ঞানের আওতাবহির্ভূত।

দুই. অনীতিসম্বন্ধীয় বিষয়গুলো থেকে নীতিসম্বন্ধীয় বিষয়গুলোকে আলাদা করার আরেকটি উপায় হলো বক্তব্যগুলো সুপারিশমূলক কিনা তা দেখা। যেমন, "বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করা উচিত" প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়" ইত্যাদি। অবশ্য এরূপ সুপারিশমূলক বাক্য নীতিশাস্ত্র, ধর্ম ও আইন-সবক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে।

তিন. নৈতিক বিচারের তৃতীয় পন্থা হলো, সর্বাবস্থায় এর গুরুত্ব বিবেচনা করা। যেকোনো মান ও গুণ বিচারে নীতির প্রশ্নটিই সবসময় প্রাধান্য পায়। এটি এমনকি শিল্প বিচার, ধর্মীয় বিচার বা আইনগত বিচারের চেয়েও ক্ষেত্রবিশেষ বেশি গুরুত্ব বহন করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক বিচারের চেয়ে ধর্মীয় বিচারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানে মূলত মূল্যবোধের প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, মূল্যবোধ কীভাবে নির্বাচিত হবে? প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে, না কি বাইরের কোন দর্শকের ভাবনা বা মতামতের ভিত্তিতে?

চার. নৈতিক বিচারের আরেকটি পন্থা হলো, কোনো কিছুর চিরন্তনতা। যে বিষয়টির নৈতিক অবস্থান চূড়ান্ত তা যেকোন জনগোষ্ঠীর জন্য যেকোন সময় ও যেকোনো পরিস্তিতিতেই সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। অন্য কথায় বলা যায় স্থান-কাল ও পাত্রের ভিন্নতার জন্য চূড়ান্ত নৈতিক বিচারটি বিভিন্নরকম হওয়া উচিত নয়। এখানে "যেকোনো পরিস্থিতিতে" বলতে কোনো বিষয়ে অভিন্ন রকম পরিস্থিতিকে বুঝানো হয়েছে। নৈতিক কোনো বক্তব্য বা অবস্থান সাধারণত: চিরন্তনবোধই হয়ে থাকে। চিরন্তনতার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে বুঝতে গেলে জানতে হবে বিষয়টির আপেক্ষিক গুরুত্বও। এছাড়া, খেয়াল রাখতে হবে সাধারণ নীতিমালা বনাম পট-প্রাসঙ্গিকতা। যিনি বক্তব্য রাখছেন তার ব্যক্তিগত চরিত্রও আমলে নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ; তা হলো, এমন অনেক নীতি-নৈতিকতার প্রসঙ্গ আছে যা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাধারণ্যে তা প্রযোজ্য নয়।

পাঁচ. নৈতিক বিচারটি হতে হবে আমজনতা-নির্বিশেষে সকলের চিন্তা মাথায় রেখে। এতে কোনো ব্যক্তিগত রুচির বিষয় নেই। এক্ষেত্রে তাসাউফের নৈতিকতা কিছুটা ব্যতিক্রম। একজন সুফিসাধকের চিন্তা, চর্চা ও অভিজ্ঞতা নিতান্তই ব্যক্তিগত অর্জনের বিষয়। এটিও সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ছয়. যে কাজের নৈতিক অবস্থানের কথা বলা হচ্ছে, সেটি হতে হবে ঐচ্ছিক ও টেকসই।

সাত. যে কাজটি সাধিত হয়েছে, তা পূর্ব অভিপ্রায় বা সংকল্প অনুযায়ী হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা। সঙ্কল্প ছিল না- এমন কোন কাজের ফল এবং যা কোন ভালো সংকল্পের ফলশ্রুতি নয়, তা নৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ শর্তটি উপযোগবাদী নীতিশাস্ত্রের বিপরীত। কারণ উপযোগবাদী (utilitarian) নীতিশাস্ত্র মতে কোনো কার্যকারণের ফলাফলটিই মুখ্য; এর পিছনের উদ্দেশ্য বা নিয়ত নয়।

আট. কোনো কাজ নৈতিকতার ভিত্তিতে মানোত্তীর্ণ কিনা তা বুঝার জন্য পারিপার্শ্বিকতাকে বিবেচনায় নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। এ শর্তটি অহংবাদী নৈতিকতাকে (Egoistic Ethics) অগ্রাহ্য করে।

নয়. কোন কাজ নৈতিক মানে উর্ত্তীণ হওয়ার জন্য তা সন্তোষজনক, সুখদায়ক ও কল্যাণকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ শর্তটি কান্টের নীতিদর্শনকে অগ্রাহ্য করে।

দশ. কাজটি কোনো প্রচেষ্টা বা উদ্যোগের ফল হওয়া; যা অনায়াসলব্ধ নয়। আল-গাযালির মতে, একটি প্রকৃত ভালো কাজ হবে সহজলব্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত ও কাঠিন্য বিবর্জিত। অবশ্য, সুশীল আচরণের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগ যা চর্চার ফলে খুব সহজেই সহজাত আচরণে পর্যবসিত হয়।

এগার. কাজটি যুক্তিভিত্তিক হওয়া। এ শর্তটি প্রথাগত নৈতিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বার. কাজটি কোনো অনুভূতি তাড়িত হওয়া। যেমন, অপরাধবোধ, লজ্জা, অনুতাপ, অনুমোদন বা অননুমোদনের ভাব ইত্যাদি।

তের. নৈতিকতার বিষয়টি অবশ্যই বাস্তবসম্মত হওয়া। মনে রাখতে হবে, নৈতিকতাকে এমন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত নয় যে, এটি অন্যান্য নৈতিক পন্থাকে বাদ দিয়ে শুধু নিজস্ব রুচি ও ভাবনার মতই হবে। এক্ষেত্রে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও আন্তঃসাংস্কৃতিক ভাবের আদান-প্রদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ইসলামী নীতিবিজ্ঞান ও ন্যায়বিচার

ইসলাম ধর্মে ন্যায়বিচার একটি সর্বোচ্চ নৈতিকতাবাচক গুণ। এ গুণটি আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত (Kamālī 1999, 147)। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় বিশ্বাসীদের ন্যায়বিচার গুণটিকে নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হলো:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرا.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার প্রাপককে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (Al-Qurān, 4:58)।

ন্যায়বিচারের অপরিসীম গুরুত্ব আলোচনায় আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً.

হে মুমিনগণ। তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতার এবং আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হবে না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তা সম্যক খবর রাখেন (Al-Qurān, 4:135)।

ন্যায়বিচারের পন্থা ও পদ্ধতিগত বিষয় আলোচনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ - وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ - وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে: যারা মাপে কম দেয় তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না আর ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না (Al-Qurān, 26:181-183)।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আরো একটি নৈতিক গুণ হলো قسط (কিস্ত), যা ন্যায়বিচার বা সমতার নীতিতে ন্যায়বিচার এরূপ অর্থ বুঝায়। بر (বির্‌র) শব্দটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে সামগ্রিক ধর্মভীরুতা ও ন্যায়পরায়ণতা বুঝাতে। অন্যদিকে قسط যদিও بر এর সমার্থক, তবু সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে তা দ্বারা বুঝায় কোন বিচারের রায় (Al-Qurān, 5:46; 22:48)।

قسط এবং عدل এ দু'টি শব্দ প্রায় সমার্থক, যা পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষতা বা পক্ষপাতহীনতা অর্থে ব্যবহৃত। ক্রিয়াবাচক শব্দ হিসেবে এটি পবিত্র কুরআনে বহুবিয়ে সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ .

> "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চারজনকে। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে (বিয়ে করবে) একজনকে অথবা (ব্যবহার করবে) তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে (Al-Qurān, 4:3)।

আবার, 'আইনগত' ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে 'আদল' এবং 'কিসত' ক্ষেত্রবিশেষে সমার্থক। আইনি পরিভাষা হিসেবে এর ব্যবহার পূর্বোক্ত আয়াতে দেখা যায়।

উপসংহার

নীতিবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের প্রায়-অধুনা শাস্ত্র হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রিক ও অন্যান্য পশ্চিমা নীতিদর্শনের দীর্ঘ ঐতিহ্য সত্ত্বেও তা আধুনিক ও সমকালীন প্রেক্ষাপটে বহুমুখী সীমাবদ্ধতায় ক্লেদাক্ত। মানবীয় জ্ঞান যেখানে পথ হারায় আসমানী দিশার যাত্রা সেখানেই শুরু হয়। সচেতন মানুষের মাঝে তার শতব্যস্ত বর্হিজগত ও বিহ্বলিত অন্তর্জগত, প্রগতিনির্ভর ও শিল্পায়িত সমাজ এবং গোলোকায়িত বিশ্বব্যবস্থা- সকল ক্ষেত্রেই নৈতিকতার অনুসরণ অনুভূত হচ্ছে গুরুত্বের সঙ্গে। একটি ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও বিশ্বব্যবস্থা বিনির্মাণে নৈতিকতা অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। নীতিবিজ্ঞানের বহুবিধ শাখা প্রশাখার মধ্যে এ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গটি যেন হারিয়ে না যায়। আল্লাহ প্রদত্ত নীতিবিধানের অকৃত্রিম ও মৌলিক আবেদনটি যেন মানবমস্তিষ্কপ্রসূত যৌক্তিক চিন্তার বিতর্কে লুপ্ত না হয়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার, মানুষের জ্ঞান কালোত্তীর্ণ নয়; এর উপযোগিতাও চিরন্তন নয়। স্রষ্টার প্রত্যাদেশীয় বাণীসঞ্জাত নীতি অমর ও অক্ষয়। এটি সীমাবদ্ধ নয় কোনো দেশ ও কালে; কোনো গোষ্ঠী ও ব্যক্তিতে। স্রষ্টানির্বাচিত সর্বশেষ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের নীতিবিধান তাই সকল গোলকে, সকল জনগোষ্ঠী ও সমাজে শাশ্বত ও চিরঅনুসরণীয়। কারণ এতেই রয়েছে সার্বজনীনতার বীজ, সকল সঙ্কুলতার ন্যায়সঙ্গত সমাধান।

Bibliography

Al-Qurān

Abdullāhi Hassan Zaroug. 1999. "Ethics from an Islamic perspective: Basic Issue". *The American Journal of Islamic Social Science*. Vol. 16. Fall 1999 No. 3.

Al-Anṣāri, Abd al-Haq. 1989. "Islamic Ethics: Concepts and prospects". *The American Journal of Islamic Social Science*. Vol. 6. No. 1.

Al-Bukhārī Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'īl. 1989. *Al-Adab Al-Mufrad*. Beirut: Dār al-Bashāyer al-Islāmiyyah.

Al-Bukhārī Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'īl. 2002. *Al-Jamī 'Al-Sahīh*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Gazālī. Abū Hāmed. 1981. *Al-Munkit min al-Dalah*. Beirut: Dār al-Andalus.

Al-Kindi, 1938. *al-Hila Fi daf al al-ahzan* (on the Art of Dispelling Sorrows), ed. H. Ritter and R. Walzwr, Rome:

Al-Qurtubi, Abū 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abū Bakr al-Anṣāri. 2003. *Al-Jami' li Aḥkam al-Qur'an*. Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub.

Al-Razi. 1939. *Rasa'il al-razi al -falsafiyah* (Al-Razi's Philosophical Writings), ed. P. Kraus, Cairo: Collected philosophical writings of Abu Bakr al- Razi). P.93

Al-Tirmidī, Abū 'Isa Muhammad Ibn 'Isa. 1417H. *Al-Sunan*. Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif.

Amartya Sen. 1990. *On Ethics and Economics*. Oxford: Basil Blackwell.

Beekun, Rafiq Issa. 1997. *Islamic Business Ethics*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

Frank. Daniel, H. 1996. *History of Islamic Ethics*. Edited by Seyyed Hossein Nasr and Oliver leaman. London and New York: Routledge.

Darrāj, Abdullah. 1982, *Dastūr al-Akhlāq Fī al-Qurān*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Devlin, Patrick. 1970. *The Enforcement of Morals*. Oxford: Oxford University Press.

Donaldson, 1953. *Studies in Muslim Ethics*. London:

Fakhrī, Majīd. 1991. *Ethical Theories in Islam.* Leiden: Brill.

Fazlur Rahman, 1985. "Law and Ethics in Islam" *In Ethics in islam* ditel by Richard G. Hovannisian, Malibu, Calif: Undena Publications.

Goldziher. 1967. *Muslim Studies*. Vol. 1. London.

H. Kilpatick. 1989. *Encyclopedia of Arabic literature*. London.

Herbert Hart. 1963. *Law, Liberty and Morality*. Stanford University Press

Hourani, George F. 1985. *Reason and Tradition in Islamic Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ibn Miskawayhi. ND. *Tahthib al-akhlaq.* edited by Ibn al-Khatib. Makkah: al-matbaʻah al-Makkiyyah wa Maktabah.

Ibn Qutaybah. ND. Uyūn al-akhbar. London & New York.

Izutsu, Toshihiko. 1959. *God and Man in the Koran*. Tokyo:

Izutsu, Toshihiko. 1966. *Ethics Religious concepts in the Quran.* Montreal: McGill University Press.

Mill. J.S. 1859. *On Liberty*. London: Wadsworth.

Kamālī, Mohammad Hāshim. 1999. *Freedom, Equality and justice in Islam*. Petaling Jaya: .

Laudon, et al, 1996. Inforamtion Technology and Society.

Mahner, Martin & Bunge, Mario. 1997. *Foundations of Biophilosophy*. Heidelbarge: Springer.

Mautner, Thomas (ed). 1996. The penguin Dictionary of philosophy. Landan: Penguin Books

Mohamed, Yasien. 2001. "The Evolution of Early Islamic Ethics", *Americal Journal of Islamic Social Sciences*. Vol. 18, No. 4.

Muslim, Abū al-Husain Muslim Ibn Hajjāj Al-Qushairī Al-Nishapūrī. 2006. *Al-Musnad al-Sahīh*. Riyadh: Dār Tayyiba.

Olson, Robert G. 1967. "Deontological Ethics" In Paul Edwards (ed.) *The Encyclopedia of Philosophy*. London: Collier Macmillan.

Pojaman, Louis. 1995. *Ethical Theories*. London: Wadsworth.

Reinhart, A. Kevin, "Ethics and the Qurʻān", in *Encyclopaedia of the Qurʻān*, General Editor: Jane Dammen McAuliffe, Georgetown University, Washington DC. Consulted online on 29 October 2017 http://dx.doi.org/10.1163/1875-3922_q3_EQCOM_00056

Roger Triqq. 1993. *Understanding Social Science*. Oxford: Blackwell.

Zaroug, Abdullah Hassan. 1993. *Al-īslām wa al-īlm al-Tajrībī*. Khartoum: Khartoum University Press.